স্বপ্ন

খায়রুল ইসলাম

সপ্তম

একটা মামলার রায় পুরো পরিবারটিকে এলোমেলো করে দিবে তা হাসান সাহেব কখনো কল্পনা করেননি। তিনি বহুবার বহুরকম মামলা পরিচালনা করেছিলেন, সেগুলো বহুবার তার ব্যক্তিগত জীবনকে দোলায়িত করেছে কিন্তু পুরো পরিবার কখনো এমন দিশেহারা হয়নি।

কয়দিন আগেও এই পরিবারে আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছিল। তিনি প্রমোশন পেয়ে ADM হয়েছেন, কী অসাধারণ ব্যাপার। ছেলেমেয়েরা আনন্দে আত্মহারা। সবাই অভিনন্দন জানাচ্ছে। প্রমোশনের আনন্দে ঢাকা ছাড়ার বেদনাটুকু কেউই বুঝতে পারেনি। শুধু বুকের মাঝে সবার একটা শূন্যতা, গলায় বাষ্পের একখণ্ড মেঘ - আর কিছু অনুভব হয়নি।

ছোট মেয়ে তিমা ‘বাবা আমাদের বাসাটা কী এখানকার চেয়ে বড় হবে?

‘গাড়ি দিবে? উহ কী মজাই না হবে!’

‘- আচ্ছা আমি সেখানে আবার ভর্তি হব? নতুন বন্ধু।’

‘- আমাকে কিন্তু এবার সাইকেল কিনে দিতে হবে? দিবে না আব্বু?’

এমনও কৌতূহলী প্রশ্নে অধীর করে তুললো তার বাবাকে। সে মাত্র নবম শ্রেণীতে উঠেছে। শরীর মনে নতুনের ছোঁয়া - সব কিছুতেই সে দেখে স্বপ্নের রঙ। বাবা বিরক্ত না হলেও মা বিরক্ত হয়ে তাকে ধমক লাগাতেন। তিমা সহজেই অভিমানে আর্দ্র হয়। এই আর্দ্রতা হাসি হয়ে পরক্ষণেই ঝরে পড়ে। আবার প্রশ্ন করে আব্বু বাড়িটা কি বাংলো টাইপ নাকি ফ্ল্যাট?

ছোট ছেলে শাওন এবার ক্লাস সিক্সে। খেলাধুলার প্রতি তার অসম্ভব ঝোঁক। ঢাকার বাড়িটাতে খেলার কোনো জায়গা ছিল না। আশপাশে ছিল না কোনো মাঠ। তাই তার কৌতূহল সেইদিকে। বাবা, বাড়ির সামনে খালি জায়গা আছে? ক্রিকেট খেলা যাবে? যাবে না?

হাসান বরাবর কম কথা বলেন। তবে সন্তানদের সঙ্গে তার ব্যবহার বন্ধুর মতো। ওদের কে কেন জানি তিনি অনেকটা প্রশ্রয় দেন। যা তার চরিত্রের সঙ্গে খাপ খায় না। ছোটবেলায় বাবাকে হারিয়েছেন বলে বাবার আদর কী জিনিস তার জানা ছিল না। তাই সন্তানদের সে অভাব বুঝতে দেন না কদাচিৎ। সাধ্যের ভেতর হলে সব করেন - বাইরে চলে গেলে প্রচণ্ড কষ্ট পান। নীরবে চোখের পানি ফেলেন।

বদলি হওয়ার অল্প কয়দিনের মধ্যেই তল্পিতল্পাসহ চলে আসেন শেরপুরে। আসার দিন তিনি চোখের পানি ধরে রাখতে পারেননি। অনেক কলিগ এসেছিল, সেই অফিসের অনেকেই আর্দ্র কণ্ঠে বলেছিল ‘স্যার আপনার মতো ফেরেশতাকে আর কাছে পাবো না ভাবতেই কষ্ট হচ্ছে! পিয়ন বলেছিল, আপনাকে দেখলে মনটা ভালো হয়ে যেতো। আশা থাকতো বুকে এখনো কেউ কেউ আছে... বলেই কান্নায় ভেঙে পড়ে সে! মানুষের কান্না তিনি সহ্য করতে পারেন না। হাসান সাহেবও চোখের পানি ছাড়েন।

অল্প কয়েক দিনের মধ্যে গুছিয়ে নিয়ে তিনি নিয়মিত অফিস করতে শুরু করলেন। শাওনকে নতুন স্কুলে ভর্তি করে দেয়া হল - তিমা আগে শহীদ আনোয়ারে পড়তো। সেখান থেকে টিসি আনা গেল না বলে ভর্তি হতে পারলো না ওখানে। তবে অস্থায়ীভাবে আসা-যাওয়া করে এখানকার নামকরা স্কুলে, আবার ভর্তি হয়ে যাবে।

এমন সময়ই মামলাটা হাতে আসে হাসান সাহেবের। বাদী-বিবাদী দুইজনই জেলে আছেন, যে অপরাধী প্রমাণিত হবেন তার আট বছরের জেল নির্ঘাত। সাক্ষ্য-প্রমাণ পর্যালোচনা করে তিনি মামলার রায় তৈরি করে ফেলেন। নিরপরাধ ব্যক্তি বেকসুর খালাস পেয়ে যাবে। নির্দিষ্ট তারিখ জানিয়ে তিনি মুলতবি করেন আদালত।

করিডর ধরে যাওয়ার সময় ডিসি সাহেবের সালামের খবর পান। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ডিসির রুমের দিকে রওনা হন। এই লোকটাকে তার কেন জানি পছন্দ হয়নি। চরিত্র বলতে কিছু নেই। ইতিমধ্যে প্রচুর টাকা কামিয়েছেন, ঢাকায় নাকি চার-পাঁচটা বাড়ি আছে তার। হাসান সাহেব হিসাব মেলাতে পারেন না। একজন ডিসি শুধু বেতনের টাকা দিয়ে কীভাবে ঢাকা শহরে চার-পাঁচটা বাড়ি করেন, সরকারি গাড়ি ছাড়াও নিজস্ব গাড়ি কেনেন! হাসান সাহেব ভেতরে ঢুকতেই ডিসি রহমান সাহেব হেসে বলেন, বসেন হাসান সাহেব।

-স্যার কিছু বলবেন? হাসান সাহেবের প্রশ্ন

-আরে, বসেন খানিকটা গল্প করি। অফিস তো চলে যাচ্ছে না।

অফিসের কাজ বাদ দিয়ে গল্প গুজব করা হাসান সাহেবের কখনোই ভালো লাগেনি। তিনি অপরাধবোধে ভোগেন। এটা যেন চুরি করা। রাষ্ট্রের দায়িত্বে অবহেলা। তিনি মুখ গোমরা করে বসে থাকেন।

-মামলাটা কী বুঝলেন?

-শেষ করে আনলাম। রায় তৈরি করে আগামী মাসে আট তারিখে দেব।

-একটা কথা ছিল, মামলটার রায় একটু বদলাতে হবে?

- কোন মামলার রায়, আমি কিছু বুঝতে পারছি না। হাসান সাহেব বিস্ময় নিয়ে বলেন।

-আপনি যেটার রায় তৈরি করবেন সেটার। কামালকে ছেড়ে দিতে হবে।

- কাকে? বিস্ফোরিত চোখে হাসান জিজ্ঞেস করেন - অনেকটা চিৎকার করেই।

-কামালকে?

-কিন্তু স্যার সে তো অপরাধটা করেছে। প্রমাণ আছে।

-থাক্ হুইপ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। তার আপন ভাতিজা। কিছু করার নেই হাসান সাহেব। তাকে ছেড়ে দিন!

-তাকে ছেড়ে দিলে অন্যজনকে শাস্তি দিতে হবে।

-দেবেন। হেসে বলেন রহমান সাহেব।

-No never! আমি পারব না এমন অন্যায় করতে! হাসান সাহেব উঠে দাঁড়ান। হনহনিয়ে চলে আসেন নিজের অফিসে, মনটা বিষাক্ত হয়ে যায় তারা। এতো বড় একটা অন্যায় তারা কিভাবে করতে বলে? এদের মুখে বাধলোনা? একবারও কি ওই নিরপরাদ মানুষটার কথা মনে পড়েনি?

হাসান সাহেব অন্যান্য কাজে মন দেন। অনেকক্ষণ পর ফোনটা বেজে ওঠে। তিনি ধরতেই অপরপ্রান্তে রাগত কণ্ঠস্বর ‘হাসান সাহেব, কাজটা করতে নাকি রাজি হচ্ছেন না? আমি হুইপ বলছি। আমার ভাতিজাকে নাকি আট বছরের জন্য ঢুকিয়ে দিচ্ছেন।’

-স্যার অপরাধ করলে শাস্তি তো পেতে হবে। ঠাণ্ডা স্বরে বলেন হাসান সাহেব। এমন অনেক হয়েছে- নতুন কিছু নয়।

-কত লাগবো? ডিসিকে বলেন, দেয়ে দিবে! নাকি প্রোমোশন চান। ছয় মাসের মধ্যে পেয়ে যাবেন?

-স্যার আমার চূড়ায় ওঠার শখ তেমন নেই। আর অন্যায় করে তো নয়ই। আপনি ভুল করছেন। আমি পারবো না।

-আপনার সাহস তো কম না। কার সঙ্গে কথা বলছেন জানেন? আপনাকে আমি কী করতে পারি জানেন?

যা বলছি শোনেন!

হাসান সাহেব ধীরে ধীরে টেলিফোনটা নামিয়ে রাখেন। কাজে ডুবে যেতে বেশিক্ষণ লাগে না। এই পেশায় এমন ফোন পেয়ে তিনি ধাতস্থ হয়ে গেছেন। বড় জোর বদলি করবে। করুক। কিছু যায় আসে না।

রাতের বেলায় এবার রহস্যময় ফোন। তার স্ত্রী পাশে এসে দাঁড়ায়। তিনি তাকে আজকের ঘটনা বলেছেন। তার মুখে উদ্বিগ্নতা। টেলিফোনটা হাসান সাহেব ধরেন।

-হাসান সাহেব, আমার নাম মনে হয় অলরেডি শুনেছেন। আমার নাম ডগ সালাম। কুত্তা সালাম।

হাসান সাহেব এবার সামান্য ভয় পেয়ে যান। হুইপের ধমক খেয়েও যেটা হয়নি এখন তা হলো। ডগ সালাম এই এলাকার সন্ত্রাসী। হেন কাজ নেই যা সে করেনি। গতবার নাকি কোন মেয়েকে প্রকাশ্যে উলঙ্গ করেছিল। ওই মেয়ের অপরাধ তাকে চড় মেরেছিল সবার সামনে। খুন করা আর পাখি শিকার তার শখ। সে স্থানীয় সাংসদের গুণধর পুত্র।

-আংকেল বাড়াবাড়ি কইরেন না। কামালকে ছেড়ে দিন।

হাসান সাহেব ফোনটা রেখে দেন। কিন্তু পরক্ষণেই আবার বাজে রিংগার। ধরবেন না ধরবেন না করে ধরেন তিনি! দেখা যাক কি বলে!

এই কুত্তার বাচ্চা, ফোন রেখেছিস কেন? যদি সুখে থাকতে চাস তাহলে উল্টাপাল্টা কিছু করবি না। তোর মেয়ে বউ তো আছে...। তুই কি চাস ওদের কিছু করি? খোদা হাফেজ।

রাগে কাঁপতে কাঁপতে তিনি ফোনটা রেখে দেন। তার স্ত্রী জড়িয়ে ধরেন তাকে। সেই রাতে এক ফোঁটা ঘুমোতে পারেননি কেউই।

পরদিন অফিস করতে গিয়ে দারুণ ঝামেলায় পড়েন। এবার ডগ সালাম

Philips Lighting

PHILIPS

সশরীরে হাজির। তাকে বের করে দিতে গেলে সে পিস্তল দেখায়। পুলিশ ডাকলে তারা আসে না। ডিসি সাহেব না করে দিয়েছেন।

-শোনেন, ব্যাপারটা আপনি গুরুত্ব দিচ্ছেন না। ত্যাদরামি করলে খবর আছে। হুইপের সঙ্গে পার্ট লও! শালা! আজ থেকে বউ মেয়েকে ঘরের বাহির হইতে দিবি না। ওদের পেলে নাচাব বুঝলি! কুত্ত নাচ! ঝাঁকা নাকা ঝাঁকা - একটা কুৎসিত ইঙ্গিত করে সে। 'যেদিন কামালকে খালাস করবি সেইদিন হইতে সব ওকে হবে। আর নয়তো আ হাঃ হাঃ...'

সালাম বেরিয়ে যেতেই হাসান সাহেব ডিসির রুমে গেলেন। সব শুনে তিনি বললেন কিছু করার নেই। আপনিই তো এর জন্য দায়ী?

আমি! আর্তনাদ করে উঠেন হাসান সাহেব।!

জীবনে এমন সহায় বোধ করেননি। বাড়ি ফেরার সময় দেখেন গাড়িটা নেই তাকে। রিকশা করে বাড়ি ফিরতে হলো। বাসায় এসে হতাশায় ভেঙ্গে পড়েন। অনেকক্ষণ ঘুম থেকে সবাইকে ডাকলেন। তিমাকে বললেন, মা কয়েকদিন তুই বাইরে বেরুস না।

-কেন বাবা? স্কুলে যাব না?

-না, বাসায় পড়াশোনা কর। শাওন বেরুবে না।

- কেন বাবা?

আমাকে হুমকি দেয়া হয়েছে। একটা মামলার রায় দেব তো। ওপর থেকে চাপ এসেছে মিথ্যা রায় দিতে হবে। আমি তাতে রাজি হচ্ছি না। তাই তোমাদের ক্ষতি করার হুমকি দিয়েছে।

বাবা অন্যরাও তো চাকরি করছে, ওদের তো কোনো সমস্যা হয় না, তিমা অভিমান করে বলে।

হ্যাঁ, মা, ওদের মতো আমি নই।

রাতে শোয়ার সময় রোকেয়া বললো, তুমি না হয় তাকে খালাস করে দাও! ঝামেলা করে লাভ আছে!

একজন নিরপরাধ মানুষকে শাস্তি দেব! আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবে?

রোকেয়া আর বলে না কিছু!

-শালা, ওই চাকরিই আমি করব না। রোকেয়া অদ্ভুতভাবে তাকায়। কখনো এমন কথা শোনেনি তার মুখে।

হাসান সাহেব জানেন এটা তার পক্ষে অসম্ভব। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবার থেকে তিনি উঠে এসেছেন। নিজের সংসার চালিয়ে গ্রামের ভাই-বোনদের সংসারও দেখতে হয়। মায়ের দ্বিতীয় সংসারের ভাই-বোনরা এখনো গরিব।

দুদিন পরে বুঝতে পারলেন সব কিছু বদলে যাচ্ছে। অফিসের সবাই অসহযোগিতা করছে। বাসায় একটা বদ্ধ বাতাস, সবাই তার জন্য সাফার করছে। দিশেহারা হয়ে পড়েন। এইভাবে থাকা যায় না। ঢাকাতে বাসাভাড়া নিতে হবে - খুব টানাটানি পড়ে যাবে। রোকেয়াকে গোপনে পাঠিয়ে দেন তিনি।

রোকেয়া দুদিন ঘুরে মনের মতো বাসা পান না। তাকে পাঁচ হাজার টাকার মধ্যে ভাড়া নিতে হবে। পরিচিত এক টিএনও-এর কাছে গেল রোকেয়া। তিনি বেশ কয়েকটা বাড়ির মালিক। কিন্তু কোনো বাসা খালি নেই। এখানে এসে আবার তিমাকে ভর্তি করতে হবে, শাওনকেও। ওহ এতো ঝামেলা। অসুস্থ হয়ে পড়ে সে। শেষমেশ একটা বাসা ঠিক হয় নাখাল পাড়ার দিকে। সাড়ে চার হাজার টাকা ভাড়া। আবার ফিরে আসে রোকেয়া। শাওন, তিমা বিশ্বাসই করতে পারছে না। তাদের ফোন ছাড়া, গাড়ি ছাড়া জরাজীর্ণ বাসায় থাকতে হবে।

- কোনো ফোন নেই?

না মা, এতো টাকা পাবো কোথায়? তোরা বড় হ, দেখবি কতো আরাম আয়েশ!

হাসান সাহেবের দু'চোখ ফেটে জল আসে। অনেক সাবধানে চলতে হবে। ওরা পারবে তো? কখনো এমন টানাটানি দেখেনি ওরা।

শাওন বাবাকে বলে, আমরা কি গরিব হয়ে গেছি বাবা?

না, বাবা বড়লোক হলাম! কয়জন আছে বল? বলতে বলতে চোখ মুছেন হাসান সাহেব।

সব কিছু গুছিয়ে ওদের গাড়িতে তুলে দিতে আসেন হাসান সাহেব। হাসান সাহেব হঠাৎ ছল ছল কণ্ঠে স্ত্রীর হাত দুটো হাতে নিয়ে বললেন, আমার জন্য তোমাদের সবাইকে সাফার করতে হচ্ছে! কি করবো বলো? কখনো কোনো অন্যায় করিনি। আজ এতো বড় অন্যায় কীভাবে করি?

মামলার রায় আগামীকাল সকালে ঘোষণা করবেন। হুইপ সাহেব আরো একবার ফোন করেছেন। ডগ সালাম বারবার হুমকি দিচ্ছে। সব কিছু কেমন যেন দিশেহারা, কোথাও কেউ নেই যেন। নাকি খালাস করে দেব? কি হবে আমি একা লড়ে! চারদিকে সবাই ধান্ধায় আছে, হরিলুট করছে দেশের সম্পদ! তিনি একা কীভাবে উল্টো স্রোতে চলবেন? আর তখনি পাশের বাসা থেকে ফোন করে তিমা, বাবা তোমাকে মিস করছি।

আমিও মা।

বাবা তুমি সাহস রাখ। আমিও তোমার মতো সৎ হবো। শাওনও বলেছে সে তোমার মতো হবে!

হাসান সাহেব আনন্দে কেঁদে ফেলেন। তিনি একা নন। এরা আসছে। এরা একদিন এসব জঞ্জাল সরিয়ে বিজয় কেতন উড়াবে। তখন আর সৎ কাজ করার জন্য এই রকম এলোমেলো হবে না সংসার। পালিয়ে বেড়াতে হবে না। আজ তিমা, শাওন তাকে আদর্শ হিসাবে নিচ্ছে। ওদের দেখে অন্যরা শিখবে। হঠাৎ তার অসহায় ভাবটা চলে যায়। জ্বলে উঠে স্বপ্নের বাতিগুলো - আশার আলো ছড়িয়ে পড়ে নবদিগন্তে।

রায়ের শেষ অংশটা লিখে ফেলেন।... কামালকে আট বছর বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হল...। টেলিফোনটা বেজে ওঠে। উঠুক - তিনি পরোয়া করেন না হুইপকে, পরোয়া করেন না ডগ সালামকে! এখনো আশা আছে এই সমাজের এই জাতির।

প্রবাসের গল্প

৬ এপ্রিল পর্যন্ত প্রবাসী লেখকদের ৭টি গল্প আমরা হাতে পেয়েছি। অনেকে বিদেশ থেকে ফোন করেও প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবেন কিনা জানতে চেয়েছেন। প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ার জন্যে ফিলিপ্স বাল্বের একটি প্যাকেট পাঠানোর শর্ত ছিল। প্রবাসীদের ক্ষেত্রে যেহেতু এই শর্ত পূরণ করা সম্ভব ছিল না, তাই আমরা প্রবাসীদের গল্প প্রতিযোগিতার আওতায় আনতে পারিনি। প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ার সুযোগ দিতে না পারলেও বাছাই করে একটি গল্প ছাপানো হলো।

আমি তোমাদের লোক

আব্দুল নাছির

হিথরো বিমান বন্দর থেকে ব্রিটিশ এয়ার ওয়েজের বিমান আকাশে উড্ডয়নের পর থেকেই শমীর পাশে বসা বিদেশী ভদ্রলোকটি ড্রিংক করা শুরু করেছিল। ড্রিংকের ফাঁকে ফাঁকে সে অনবরত কথা বলছে শমীর সঙ্গে। ভদ্রলোকের গন্তব্য বাংলাদেশের সিলেট। সিলেটের কোনো এক জায়গায় চিরনিদ্রায় শুয়ে আছে তার বাংলাদেশী বাবা। বাবার মৃত্যুবার্ষিকী আগত প্রায় তাই ভদ্রলোকের এই বিমান যাত্রা। ভদ্রলোক বলেই চলেছে, প্রতিবছর তার বাবার মৃত্যুর মাসটাতে তাকে এক অস্বস্তিকর যন্ত্রণা তাড়া করে। তাই যতক্ষণ সে তার বাবার অন্তিমশয্যার পাশে যেয়ে দাঁড়াতে না পারে ততক্ষণ স্বস্তি পায় না। শমীর মা জয়া বসেছিল মাঝের সারির সিটে। সেখানে থেকে বার বার বিরক্তি ভরা তীক্ষ্ণ সৃষ্টি ছুঁড়ে দিচ্ছিল তার ছেলের দিকে। জয়া পেশায় স্কুল শিক্ষক। কিন্তু শিক্ষক হলে কি হবে? রক্ষণশীল এবং উদার মনোভাবের এক মিশ্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তার। মদ পান করে যে এক কথায় প্রকাশ করলে হয় 'মদ্যপ'। আর মদ্যপ মানেই আমাদের দেশের শিক্ষকদের কাছে গা ঘিন ঘিন করা এক খারাপ চরিত্রের ব্যক্তি। শমী ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তার মাকে বলে, ভদ্রলোকের বুকের ভেতর অনেক ব্যথা জন্মে আছে। সে কথাই সে আমাকে বলছে। ছেলের কথা শোনার পর জয়ার ভাবনার পাখা মেলে অন্যদিকে। জয়ার ভাই শুভ। শুভকে নিয়ে এক বিব্রতকর অবস্থা তার। হঠাৎ করেই একদিন শুভ পাড়ি জমিয়েছিল ইউরোপে। স্বপ্ন দেখেছিল এক সচ্ছল জীবনের। কিন্তু হিসেব মেলেনি শুভর। বাস্তবতার ধাক্কা খেতে খেতে সে একদিন কি যেন ভেবে বিয়ে করে বসল বিদেশিনী 'মেম'কে। এরপর তাদের সংসারে এলো সন্তান। সাদা আর শ্যামলার মিশ্রণে

Philips Lighting

PHILIPS

PHILIPS